শির্ক কী ও কেন?

বিভাগ/অধ্যায়ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী

ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি

তৎকালীন ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অধঃপতন এখানেই শেষ নয়। আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ এমনও তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ এর যুগে ভারত ও বাংলার মুসলিমগণ শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব মুসলিম ছিলেন। তারা বিশ্বাস ও কর্মে হিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় সেখানে যদি সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তাঁদের সহযোগীদের পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক আন্দোলন না হতো, তা হলে হয়তো বা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। এ সব তথ্য প্রমাণের মধ্য থেকে নিম্নে জার্মানীর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Hans Kohn এর “A History of Nationalism in the East” গ্রন্থ হতে সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে তাঁর কিছু কথার অনুবাদ তুলে ধরা হলো। তিনি ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও এর প্রভাব সম্পর্কে বলেন :

“আফ্রিকার মত ভারত এবং সুমাত্রায়ও ওয়াহাবী আন্দোলন মুসলিমদের মধ্যে একটা উদ্দীপনাময়ী ও প্রাণ সঞ্চারক শক্তি হয়ে পড়ল এবং অস্থায়ীভাবে হলেও মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রথম যুগের ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া। তা ইউরোপীয় প্রভাবের বিরোধী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে ওয়াহাবীদের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ ও হাজী মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল। মক্কায় হজ করতে গিয়ে তাঁরা ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় কলুষপরায়ণতা এবং হিন্দু রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সাথে মুসলিম রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মিশ্রণ দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

তাঁরা ওয়াহাবী আদর্শে ভারতে ইসলামের সংস্কার সাধনে নিজেদের উৎসর্গ করবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। তৎকালে অনেক লোক বিশেষ করে ভারতে শুধু নামে মাত্র মুসলিম ছিল। তারা হিন্দুদের রীতিনীতি মেনে চলতো। তাদের পর্ব-পার্বনের অনুষ্ঠান করতো। বিবাহ-শাদী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তারা তাদের আইন-কানুন মেনে চলতো এবং তাদের বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতো। ওয়াহাবীদের প্রচেষ্টায় এ সবের পরিবর্তন হতে লাগলো। ইসলামকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা হলো। ইসলামের প্রথম যুগের পবিত্র-নৈতিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনা হলো এবং শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলো...”।[1]

তৎকালীন ভারতীয় ও বাংলাদেশী মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে Lt. Col. U. N. Mukherji Zuvi “A Dying Race” গ্রন্থে যা লিখেছেন তাথেকেও কিছু কথা অনুবাদ করে নিম্নে বর্ণনা করা হলো। তিনি বলেন :

“পঁচাত্তর বছর আগে একজন মুসলিম কৃষক ও একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে সামান্যই তফাৎ ছিল। শুধু নাম ছাড়া মুসলিম কৃষক ও হিন্দুদের মধ্যে অধঃপতিত জাতের লোকের পার্থক্য করার আর কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদেরকে হিন্দুদের একটা নীচ জাতি বলে গণ্য করা হতো। তারা সমান অজ্ঞ ও সমান দরিদ্র ছিল। তাদের

আচার ব্যবহার, জীবন যাপনের ধরণ ও ধর্মাচরণ একই রকম ছিল।”

তিনি আরো বলেন : “একজন স্থানীয় লেখক দক্ষিণ বাংলার ...উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হতে বলেছেন- প্রতি দশজনের মধ্যে একজনও সামান্য কলেমা পর্যন্ত জানে না, অথচ জ্ঞাতে হোক আর অজ্ঞাতে হোক সর্বদা এই কলেমা পড়া মুসলিমদের একটা অভ্যাসের ব্যাপার। তিনি তাদের এমন একটি সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন যে, যারা নিজেদের ধর্মের কোনো নিয়ম মেনে চলে না, বিধর্মীদের মন্দিরে গিয়ে পূজা করে এবং ইসলাম প্রবর্তক যে-সব রীতিনীতি অতিশয় ঘৃণ্য বলে পরিত্যাগ করেছেন, তারা তা-ই আকড়ে রয়েছে।”

এর পর সবকিছুর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে হিন্দুও নন মুসলিমও নন এমন একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই ভাল। ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বিবরণকে যথেষ্ট প্রামাণ্য বলে ধরা যায়। উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

“পঞ্চাশ বছর আগে কথাগুলোর দ্বারা শুধু উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর নয়, সমগ্র বাংলার মুসলিম কৃষকদের অবস্থা বুঝানো যেতো। শুধু শহরে অথবা মুসলিম আমির ও ওমরাদের প্রাসাদের শান্ত জীবনে এবং তাদের ধর্মস্থানে নিষ্ঠাবান এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন কতিপয় মৌলভী নিয়মিত ধর্মানুষ্ঠান করতেন। কিন্তু পল্লী এলাকার মুসলিম জনসাধারণ যে অবস্থার মধ্যে ছিল, তা খতনা করা নীচ হিন্দু জাতির বর্ণ শঙ্করের চেয়ে সামান্যই উন্নত ছিল। এরপর ভারতে ধর্মীয় জাগরণের ওই প্রবাহ বাংলার মুসলিমদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। প্রধানত উত্তরাঞ্চলের পরিব্রাজক প্রচারকগণ জেলা হতে জেলান্তরে গমন করে মুসলিমদের আবার ঈমানের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং বেখেয়াল ও অন-অনুতপ্তদের উপর আল্লাহর গজব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে লাগলেন। ফলে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলিম পুরাপুরিভাবে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করে শুদ্ধ হলেন এবং প্রাচীন কাল হতে গ্রামে গ্রামে যে সব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা ত্যাগ করলেন...।”[2]

উপরে ভারত ও বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত যে বর্ণনা তুলে ধরা হলো, এথেকে তাদের ধর্মীয় অবস্থার যে কী করুণ দশা হয়েছিল, তারা যে কী পরিমাণ শির্ক, বেদ‘আত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়েছিল, সে সবের একটা অনুমান করা যায়।

উপর্যুক্ত এ সব তথ্য প্রমাণের সাক্ষ্যদাতাগণ বহির্দেশীয় ও অমুসলিম হয়ে থাকলেও আমাদের হাতে স্বদেশীয় মুসলিম মনীষীদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, যা অমুসলিম মনীষীদের উক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) এর কথা বলতে পারি। কালের পরিক্রমায় যে মুসলিমদের মাঝে শির্কী ধ্যান-ধারণা বিস্তারলাভ করেছিল, এর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

“অতঃপর যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী এবং তাঁর দ্বীন বহনকারীগণ বিদায় হয়ে গেলেন, তখন তাঁদের পশ্চাতে এমন সব লোকদের আগমন ঘটলো যারা সালাতকে বিদায় করে দিলো, নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আরম্ভ করলো। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট অর্থবোধক) শব্দসমূহকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে লাগলো, যেমন আল্লাহর বন্ধু হওয়া ও তাঁর নিকট শাফা‘আত করা- যা আল্লাহ তা‘আলা সকল শরী‘আতেই কেবল বিশেষ মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন- সেটাকে তারা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে লাগলো। অনুরূপভাবে কারো দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে বা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

মধ্যে তারা (আল্লাহর) জ্ঞান স্থানান্তরিত হয়েছে এবং প্রকৃতি সে লোকের বাধ্য হয়েছে বলে মনে করতে লাগলো ...এ-জাতীয় রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার : কেউবা আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে তাদের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে যাদেরকে সে আল্লাহর সমতুল্য বলে জ্ঞান করেছে।

এ কারণে তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন (আল্লাহর বদলে) তাদের কাছেই পেশ করতে রয়েছে। আল্লাহর দিকে তারা মোটেও ফিরে তাকায় না...এদের কেউবা মনে করে আল্লাহ হলেন মূল পরিচালক ও সরদার, তবে কখনও তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে মর্যাদা ও উলূহিয়্যাতের পোষাক পরিয়ে দেন, তাকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করেন, তাঁর বান্দাদের অভাব ও অভিযোগ শ্রবণের ক্ষেত্রে তাঁর শাফা‘আত শ্রবণ করেন, তাদেরকে রাজা-বাদশাদের প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেন, যাদেরকে বাদশাগণ তাঁদের দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে সে এলাকার ছোট ছোট বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন।...এ ব্যাধি হচ্ছে সকল ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের এবং আজ পর্যন্ত যারা দ্বীনে মুহাম্মদী এর অনুসারী অথচ অতিরঞ্জিতকারী ও মুনাফিক তাদেরও রয়েছে এ ব্যাধি।’’[3]

তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলেন :

‘‘মুশরিকদের অবস্থা, তাদের বিশ্বাস ও কর্ম অনুধাবন করতে তোমার অসুবিধা হলে আমার যুগের সাধারণ ও মুর্খদের অবস্থার প্রতি নজর কর, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার যারা ইসলামী দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে বেলায়েতের ব্যাপারে তারা কী ধারণা পোষণ করে? অলিগণের বেলায়েতকে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, এ যুগে কোনো ওলি পাওয়া যাওয়া দুস্কর, তারা ওলিদের কবর ও তাঁদের নিদর্শনের স্থানসমূহে যায় এবং নানাধরনের শির্কী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।’’[4]

বস্তুতঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি:) তাঁর এ-দু’টি বক্তব্যের দ্বারা পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর সময় পর্যন্ত মুসলিমরা যে আক্বীদাগত বিকৃতির কারণে শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, সে বিষয়ের দিকেই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। আউলিয়া ও দরবেশদেরকে মুসলিমরা কিভাবে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে শরীক করে নিয়েছিল, সে বিষয়টি তিনি তাঁর এ-দু’টি বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

পূর্ব থেকে শুরু করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)এর সময়কার এক শ্রেণীর মুসলিমদের অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে, তবে তৎকালীন বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের যে কি করুণ দশা হতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ তাদের আক্বীদা ও আমলের অবস্থা ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছিল এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বেদ‘আত ও কুসংস্কার ছেয়ে গিয়েছিল, তা তাদের মাঝেও সমানভাবে প্রসার লাভ করেছিল। যে সকল সূফী ও সাধকগণ এ দেশে এসেছিলেন তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, কালের পরিক্রমায় সাধারণ মুসলিমগণ তাঁদের কবর ও কবরসমূহকে তাওহীদ বিনাশের একেকটি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও চারিত্রিক অধঃপতনের যুগে সমগ্র ভারত ও বাংলায় যখন বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ দেশের মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা নাজুক থেকে নাজুকতর হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েন বলেন :‘‘বাংলাদেশে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে এখানকার মুসলিমদের ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়, অবস্থা এতই খারাপ হয়ে দাড়ায় যে, মুসলিমদের (দৈনন্দিন) জীবনে নানাবিধ বেদ‘আতী কর্মকাণ্ড ও কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করে, মুসলিমরা হিন্দুদের দেবতাদের নামে মানত এবং কবর, পীর ও কবর পূজা করতে থাকে। গাজী ও

ফাতেমার নামে হালুয়া প্রদানসহ অন্যান্য ধর্মাদ্রোহী কর্ম করতে আরম্ভ করে।”[5]

>

ফুটনোট

[1]. তদেব; পৃ. ১৯১-১৯২; Hans Kohn, A History of Nationalism in the East. p. ১৫।

[2]. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত;১৯৪-১৯৫। তিনি এ কথা গুলো থেকে উদ্ধৃত করেছেন। lt. Col. U. n. Mukherji, A Dying Race; p.৮৯-৯১।

[3]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; ১/৬১।

[4]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর; (দেওবন্দ : কুতুবখানা হেজায, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ৫১।

[5]. গোলাম ছাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12573

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন